মুখবন্ধ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতির জন্য দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। যা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর অপর নির্দেশনা বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক মুক্তি। জাতির পিতা স্বাধীনতার পর পরই দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে তোলেন। বিশ্বে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি জাতির পিতাকে বেশী দূর এগুতে দেয়নি। তারা পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। শুরু হয় বাংলাদেশের পশ্চাৎমুখী যাত্রা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন থমকে দাঁড়ায়। মানুষের মন থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও চেতনা মুছে ফেলার হীন চক্রান্তে নামে স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র। একাত্তর পূর্ববর্তী অবস্থায় চলে যায় প্রিয় স্বদেশ। কিন্তু এই অপশক্তি বাঙালিকে চিরকালের জন্য দাবিয়ে রাখতে পারেনি।

পাকিস্তানী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভুত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। আর ১৯৯৬ এ বাঙালির আর্থ-সামাজিক মুক্তির কাণ্ডারী হন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি দেশকে আবার উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেন। অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় করেন। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেন। সমাজে শান্তি ফিরে আসে। জনগণ নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী ও তাদের দোসরদের চক্রান্ত থেমে থাকেনি। তারা জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দেয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ায়। ২০০১ সালের ষড়যন্ত্রের নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উপর অবর্ণনীয় হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও চালায়। দেশ আবার আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। জেএমবি, হিজবুত তাহরীর মতো নিষিদ্ধ সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে তাদের অপতৎপরতা চালাতে শুরু করে। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা, ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট ৬৩ জেলায় একই সময়ে প্রায় ৫০০ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। সিলেট, সাতক্ষীরা, ঝালকাঠি, ময়মনসিংহসহ দেশব্যাপী বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যা করে। উত্তরাঞ্চলে বাংলা ভাই ও আবদুর রহমানরা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। বিএনপি যুদ্ধাপরাধী-স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে ভেজা পতাকা তুলে দেয়। ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয়

দেয়। জনগণের নাভিশ্বাস উঠে। বিএনপি-জামাত জোট একদিকে অত্যাচার, নির্যাতন, সন্ত্রাস, জঙ্গী তৎপরতা, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, হত্যা ও দুঃশাসন চালায়। অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে। বিদেশে বাংলাদেশকে বন্ধুহীন করে। ২০০৬ সালে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ভুয়া ভোটার তৈরী করে প্রহসনের নির্বাচন করতে চেয়েছিল। জনগণ তাদেরকে সেই অপকর্ম করতে দেয়নি।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে জনগণ বিএনপি-জামাতের দুঃশাসনের চরম জবাব দেয়। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই জনগণের নিকট নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ শুরু করেন। তিন মাসের মধ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসেন। বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব সফলভাবে মোকাবেলা করেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেন। বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস করতে সমর্থ হন। জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করেন।

ইশতেহারে ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) প্রণয়ন করে। এর আলোকে বার্ষিক বাজেট ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকার বিগত চার বছরে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা, শিক্ষার হার ও মান উন্নয়ন, শিশু ও নারীসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, সড়ক, রেল, নৌ-যোগাযোগ ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষির বিকাশ, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপকল্পে দেয়া লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেছে। সরকারের এ অনন্য সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান "অগ্রগতির চার বছর"।

সরকার চার বছরে জনগণের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করেছে। ৩ হাজার ৮৪৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। সর্বোচ্চ ৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। জনগণ লোডশেডিং এর দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েছেন। সেচপাম্পগুলো পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ পাচ্ছে। ৩০ লক্ষ নতুন গ্রাহক বিদ্যুৎ পেয়েছে। দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। গ্যাস সরবরাহ দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট বেড়েছে। এই গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প-কারখানা পরিচালনা, গৃহস্থালী কাজ, সার উৎপাদন ও গাড়ীর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশে ছোট-বড় প্রায় ২১ হাজার কিলোমিটার

সড়ক ও ১৩টি বৃহৎ সেতু নির্মিত হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি ফ্লাইওভার নির্মিত হয়েছে। ২২ জোড়া নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। ২০ জোড়া ট্রেনের সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নদী খনন উপযোগী বড় ড্রেজার ক্রয় করা হয়েছে। ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং ভূমি ভরাট করা হচ্ছে। এ জমি ভূমিহীন, দুঃস্থ ও গৃহহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। স্থল ও নৌ-বন্দরগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে।

দেশের অর্থনীতি বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচক ইতিবাচক ধারায় অগ্রসর হচ্ছে। প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। রপ্তানি আয়ে বার্ষিক গড়ে ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির হার বেড়েছে। রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে গড়ে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ কর্মজীবী প্রবাসে গেছেন। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ছে। রাজস্ব আদায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় ২৩ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫৫ হাজার কোটিতে পৌঁছেছে। দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ৮৫০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষের দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে দেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষিপণ্য বহুমুখীকরণ ও গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। ৩৯২ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে। ইপিজেডগুলোতে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের এ অগ্রযাত্রা প্রশংসিত হচ্ছে। বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল।

সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়েছে। ভাতা ছাড়াও কর্মসংস্থানের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের পর সহজ শর্তে মূলধন যোগান দেয়া হচ্ছে। ফলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নআয়ভোগীদের সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হচ্ছে। তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ টেকসই হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠীও এ কর্মসূচীগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধা পেয়েছে। বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত হয়েছে। মানুষের কর্মক্ষমতা বেড়েছে। জাতীয় উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। উত্তরাঞ্চলে এখন আর মঙ্গা নেই। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ অনেক বৃদ্ধি করা

হয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, উপ-বৃত্তি, বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার সুযোগ অনেক বাড়ানো হয়েছে। ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এগুলোর ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরী জাতীয়করণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়নে এক নবযুগ সৃষ্টি হয়েছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান ও জননন্দিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর "জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল" এবং "শান্তির সংস্কৃতি" প্রস্তাব জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করেছে। তাঁর উত্থাপিত এবং জাতির পিতার দৌহিত্রী আন্তর্জাতিক অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা হোসেন পুতুলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশ্বব্যাপী "অটিজম সচেতনতা" সৃষ্টির লক্ষ্যে আরেকটি প্রস্তাব জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ বিরল সম্মান অর্জন করেছে। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেয়া হয়েছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মায়ানমারের সাথে সমুদ্র জয়ের ফলে বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সামর্থ্য অনেক বাড়ানো হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ এখন শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। সরকার গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্রিয় করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের ১৪টি উপনির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের ৫ হাজার ৫০৯টি নির্বাচন ও উপনির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীসহ সিটিগুলোতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে। ক্রিকেটসহ ক্রীড়াক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। নারী ও শিশু উন্নয়নে সাফল্য অর্জন করায় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করেছে। "ডিজিটাল বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের বিচার করা বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতি আজ আবার জেগে উঠেছে। দেশকে রাজাকার-যুদ্ধাপরাধী-জঙ্গী-জামাতমুক্ত করতে সব প্রজন্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সরকার যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের বিচারের লক্ষ্যে হাইকোর্টের ৬ জন বিচারপতি সমন্বয়ে দুইটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে রায় দেয়া শুরু হয়েছে। বিএনপি'র প্রত্যক্ষ মদদে জামাত-শিবির দেশে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে।

বর্তমান সরকার জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক, সমৃদ্ধ

বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে বিগত চার বছরে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। এ অগ্রগতি বিশ্লেষণ করলে এটি প্রতীয়মান হবে যে সরকারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ খুব দূরে নয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ অগ্রযাত্রায় অবদান রাখতে হবে। এর মধ্য দিয়েই জাতির পিতার মুক্তির সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন হবে।

৬ জানুয়ারী ২০১৩